মা এর জীবনের স্মৃতিচারণ ও অলৌকিক ঘটনা

সংকলণ

৫ই কার্ত্তিক, ১৪২৭

২২শে অক্টোবর, ২০২০

মা এর জীবনের
স্মৃতিচারণ
ও
অলৌকিক ঘটনা

সংকলণ

৫ই কার্ত্তিক, ১৪২৭

২২ শে অক্টোবর, ২০২০

সূচীপত্র

আধ্যাত্মিক ও প্রাতঃ স্মরণীয় বংশ

আমার বাপের বাড়ীর দেশ হালিশহর, তার আগে আমার ঠাকুর দাদার বাবা গিরীশচন্দ্র থাকতেন কলিকাতায় কাঁসারি পাড়ায় ভাড়া বাড়ীতে। যখন আমার ঠাকুর দাদার বয়স মাত্র ২১ বছর তখন তিনি এম.এ. পরীক্ষা দিচ্ছেন। সেই সময় তাঁর বাবা মারা যান তিনি তার প্রথম সন্তান (নাম কিশোরী মোহন সেনগুপ্ত) সংসারে উপায় করবার আর কেউ নেই, তাঁরা পাঁচ ভাই তিন বোন বিধবা মা। মাত্র বড় মেয়ে ও বড় ছেলের বিবাহ হয়েছে। আর সব ভাইরা ছোট ছোট মেজ বোন বিবাহ যোগ্যা ১০ বছর বয়স। তাঁর বাবা এক জনকে ৫০০্ টাকা ধার দিয়েছিলেন তিনি কিছু রেখে যেতে পারেননি। তাই মৃত্যু শয্যায় শুয়ে তাঁর স্ত্রীকে বলছেন ওই কুলুঙ্গিতে একখানা দলিল আছে আমায় দাও। তিনি তাঁর হাতে দিতে সেখানি ছিঁড়ে কুচি কুচি করে ফেলে দিলেন। স্ত্রী বললেন ওকি করলে তুমি, বললেন না কিশোরী ছেলে মানুষ, অভাবে পরে যদি তাদের ভিটা ছাড়া করে তাই করলাম। মা বললেন, তাহলে কিশোরীর কি হবে তখন উপরে হাত তুলে প্রণাম করে বললেন যিনি জগৎকে দেখছেন তিনি দেখবেন আমার কিশোরীকে, অটল বিশ্বাস ঈশ্বরের প্রতি। কিশোরীও তেমনই কৃতী সন্তান ছিলেন পরীক্ষায় ৩২্ টাকা স্কলারশিপ পেলেন। কলিকাতার বাড়ী ছেড়ে দিয়ে সবাইকে নিয়ে মামার বাড়ী হালিশহরে গিয়ে রইলেন। সেখানে তিনি হুগলী মহসিন কলেজে গণিতের প্রফেসার হলেন। তার তৃতীয় যে ভাই যতীন্দ্র মোহন পরম বৈষ্ণব ছিলেন (বৈষ্ণবের পরাকাষ্ঠা ছিলেন) চতুর্থ ভাই তিনি

এক মহাপুরুষ (অবতার পুরুষ ছিলেন) উপেন্দ্র মোহন কনিষ্ঠ ভাইও খুবই ভাল লোক ছিলেন। তাঁদের পূর্ব পুরুষ ছিলেন গোবিন্দ চন্দ্র বরাট পরে সেনগুপ্ত হন। তিনি অল্প বয়সে তাঁর সন্ন্যাসী বৈষ্ণব গুরুর সঙ্গে সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যান। গুরু একদিন তাঁকে বললেন গোবিন্দ তুমি গৃহে ফিরে যাও আমি ধ্যানে দেখেছি তোমার বংশে মহাপুরুষ জন্মাবেন তিনি গুরুর আদেশে তার বাড়ী কাঁচড়া পাড়ায় ফিরে এলেন। তখন ওইখানেই জমি বাড়ী ছিল। তারপর তাঁর ভাইপোরা তাঁর জমি ফিরিয়ে দিতে চাইলেন তখন তিনি বললেন যা আমি ত্যাগ করে গিয়েছি আর ফিরিয়ে নেব না। একটি গাছ তলায় মাটির কুঁড়ে তৈরি করে থাকলেন। সেইখানে তাঁর বিবাহও হলো। তিনি একটি গোপাল প্রতিষ্ঠা করে পূজা করতে লাগলেন দীর্ঘদিন তাঁর সন্তান হলো না দেখে তিনি গোপালের কাছে প্রার্থণা করতেন, ঠাকুর যার জন্য আমায় আবার সংসারি করলে ঠাকুর তাতো কিছুই হলোনা আমি মরে গেলে আমার শ্রাদ্ধ করবে কে, তাঁর মৃত্যু শয্যায় শুয়ে কাঁদতে লাগলেন। তখন শুনতে পেলেন গোপাল বলছেন আমি তোর শ্রাদ্ধ করবো। তখন শান্তিতে প্রাণ ত্যাগ করলেন। কিন্তু তিনি জানতে পারেননি যে তাঁর স্ত্রী সন্তান সম্ভবা হয়েছেন।

গোপাল ১০০ বছর তাঁর শ্রাদ্ধ করেছিলেন। শ্রাদ্ধ করার সময় গোপালের হাতে কুশের আংটি পরিয়ে দেওয়া হতো যেই শ্রাদ্ধ শেষ হতো অমনি আপনি সেই আংটি খুলে পরে যেত। আমার ন ঠাকুর দাদা (উপেন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত) সেই বংশে অবতার পুরুষ হয়ে এসেছিলেন। তিনি কত

লোককে যে ভগবত পথে নিয়ে গিয়েছেন তার ইয়ত্ত্বা নেই। কত কল্যাণ করেছেন মানুষের। আমার বাবা অবনী রঞ্জণ সেনগুপ্ত তাঁর ত্যাগ তিতীক্ষা ও ভগবৎ ভক্তি খুব বেশি ছিল। তিনি হিন্দু স্কুলে হেড মাষ্টার ছিলেন, আমার কাকা নলিনী রঞ্জন সেনগুপ্ত বিখ্যাত ডাক্তার ছিলেন। তিনি সত্য পুরুষ ত্যাগী ব্রহ্মচারী ছিলেন। আমার ঠাকুমা প্রাতঃ স্মরণীয়া মহিলা ছিলেন আমার নঠাকুমা সতী শিরোমণি সীতা সাবিত্রীর মত ছিলেন। আমার মাও সতী শিরোমণি ছিলেন তাদের কাছে ত্যাগ তিতিক্ষা শিখবার মত ছিল। আমার বাপের বাড়ীর গোপাল আছেন প্রায় ২৫০ - ৩০০ বছরের ঠাকুর, আমার বাবার ঠাকুমার পুজিত ঠাকুর। তাঁর এখনও পূজা হয় শ্রাবণ মাসে পাঁচ দিন খুব সমারোহে ঝুলন হয়। আর কালী পূজার পর দিন অন্নকূট হয় বহু লোক প্রসাদ পায় প্রায় সাত/আটশো লোক হয়। একবার ঝুলনের সময় গোপালকে খুব সুন্দর এক খানি কাপড় পড়িয়েছেন খুব ভাল দেখাচ্ছে, আমার ঠাকুমা দুই চোখে অন্ধ ছিলেন দিন রাত বুঝতে পারতেন না। তিনি বলছেন নবৌ ভাই তুমি গোপালকে কি সন্দুর গোলাপি রংয়ের কাপড় পড়িয়েছো কি চমৎকার দেখাচ্ছে ভাই। তিনি সর্ব্বদাই গোপালকে দেখতে পেতেন, গোপালের বাঁশী শুনতেন। নূপূরের ধ্বনি শুনতেন। একবার পৌষ মাসে হালিশহরে লক্ষীপূজা করতে গিয়েছেন যে দিন ফিরছেন, আমরা ছোট ভাই বোনেরা ঠাকুমাকে শিয়ালদহ স্টেশনে চারু জ্যাঠামশাই এর সঙ্গে আনতে গিয়েছি গাড়ী করে, দেখি ঠাকুমা নিজের গায়ের র‍্যাপার খানা পরে ট্রেনের কামড়ায় বসে আছেন চারু জ্যাঠামশায় জিজ্ঞাসা

করলেন একি মা আপনার কাপড় কোথায় বললেন একটি ভিখারী কষ্ট পাচ্ছিলো তার কাপড় নেই তাই তাকে দিয়ে দিয়েছি। আমি তো বাড়ী যাচ্ছি গিয়ে কাপড় পড়বো বাবা। জ্যাঠামশাই নিজের গায়ের বড় র‍্যাপার খানা দিয়ে ঠাকুমাকে জড়িয়ে নিয়ে বাড়ী এলেন। বলছেন সবাই দেখে যাও আমার দয়াময়ী মাকে দান কি করে করতে হয় শেখো - সবাই প্রণাম করলেন ঠাকুমাকে।

-----x-----

জাগ্রত গোপাল

আমার ছেলে মেয়ে বলছে - আমি যা যা কৃপা পেয়েছি লিখে রাখতে। শ্রী গুরুদেব আমার ক্ষমতা দিন - এই প্রার্থনা। তবেই পারবো আমার তখন ছয় বছর বয়,, আমার বাবার মেজ পিসিমা, কাশীবাসী তিনি বছরে একবার করে আসতেন ও বেশ কিছুদিন থাকতেন। তিনি একবার কাশী থেকে ছোট ছোট পিতলের গোপাল এনে আমাদের সব বোনেদের দিয়েছিলেন। আমি গোপাল খুব ভাল বাসতাম তাই খেলার ছলে যা পারি পূজা করতে লাগলাম ও রোজ ঠাকুরকে দুটা বাতাসা দিয়ে ভোগ দিতাম। আর যা যা সব শিখেছিলাম তাই বসে পূজা করতাম। একদিন ভোগ দিতে বাতাসা পাইনি তাই রান্নাঘরের কাছে গিয়ে ঠানদির কাছে বাতাসা চাইলাম তখন সন্ধ্যাবেলা, ঠানদি বললেন তোর গোপালকে রোজ রোজ বাতাসা দিতে হবে না ঠাকুর এমনিই ঘুমিয়ে পরবেন। তাই শুনে আমার খুব দুঃখ হয়েছে আমি খুব কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছি রাত্রে কিছু না খেয়ে। প্রায় অনেক রাত্রে গোপাল একটি ছোট্ট ছেলের রূপ ধরে বলছেন তোমরা সবাই খেলে আর আমাকে খেতে দিলে না দেখতো আমার কত খিদে পেয়েছে বলে পেট দেখাচ্ছেন ঠানদিকে, ঠানদি তখন তাড়াতাড়ি উঠে রাত্রে এসে আমায় ডাকছেন বলছেন পাবু ওঠ মা তোর গোপালকে খেতে দে। বলে মুখ হাত ধুয়ে কাপড় ছেড়ে আমায় বাতাসা দিলেন, আমিও মুখ হাত পা ধুয়ে জামা কাপড় ছেড়ে গোপালকে তুলে ভোগ দিলাম। আমার ঠাকুমা যেমন শিখিয়ে ছিলেন তেমনি ভাবেই ভোগ দিলাম

আর ঠানদি তখন কান মুলে প্রণাম করে বলছেন আমি বুঝতে পারিনি ঠাকুর যে তুমি এমনি বাবে পাবুর কাছে এসেছো, আমার অপরাধ ক্ষমা কর ঠাকুর। **সেই গোপাল এখন আমায় কৃপা করে আমার পূজা নিচ্ছেন, তাঁর চরণে প্রার্থণা আমি যেন শেষ পর্য্যন্ত তাঁরই চরণে পড়ে থাকতে পারি ও সেবা করতে পারি।**

(ঠান্‌দি আমার বাবার কি রকম খুড়িমা হন। তাঁরা বড় গরীব তাই আমার বাপের বাড়ীতেই থাকতেন স্বামী স্ত্রীতে। হালিশহরের লোক তাঁরা)

এই খবর শুনে মধুসূদন স্বামীজি মহারাজ সাষ্টাঙ্গে গোপালকে প্রণাম করে আমায় বলছেন পার্ব্বতীজি তুমতো ধন্য হো গিয়া ভগবান কে কৃপা মিল গিয়া তুমহারা। আমি তাঁকে প্রণাম করলাম মা বললেন মহারাজ আপ আশীর্ব্বাদ কিজিয়ে তবহি ইনকো ভালা হোগী। (ইনি রামানুজ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী)

-----x-----

চিনিদির বিয়ে

আমার যখন ৮ বছর বয়স তখন চিনিদির বিয়ে (আমার নতুন পিসিমার মেয়ে চিনিদি) হাওড়ায় একটা বাড়ীতে তাঁরা ভাড়া থাকতেন। সেই বাড়ীর জামাই (বাড়ীওয়ালার ঘর জামাই থাকতো)। আমরা সবাই খুব আনন্দ করে বিয়ে বাড়ী গিয়েছি। আমি দেবী তো ছোট তাই একসঙ্গে গিয়েছি। আর দিদিরা বড় তাই তারা এক সঙ্গে আছে। সেই বাড়ীওয়ালার জামাইটা অন্নাদা ঠাকুরের শিষ্য, গেরুয়া আলখাল্লা পরা লম্বা চুল গোঁফ দাড়ী কত যেন আমায় চেনে। সে আমায় দেখেই আমার হাত ধরে নিয়ে ঘরের মধ্যে একটা আসনে বসিয়ে পায়ে জবা ফুল দিয়ে পূজা করছে আর বলছে মা তুই এই রূপে এলি মা বলে কি সব স্তব পড়ছে। আমি আর দেবী দুজনেই ভয়ে খুব কাঁদছি দেখে সেই বাড়ীর মেয়েরা আমাদের বলছে তোমরা এত কাঁদছো কেন? দেবী কাঁদছে, বলছে ছোড়দি যে ঠাকুর হয়ে গেছে এখন কি হবে? তখন তারা আমাদের সরিয়ে নিয়ে এসে বললে ও কিছু হয়নি তোমরা তোমাদের দিদির বিয়েতে এসেছো যাও বিয়ে দেখগে আনন্দ করগে। তারপরে নতুন পিসিমার বাড়ী ভয়ে দুবোনে আর কখনো যাইনি।

-----x-----

দীক্ষা গ্রহণ

একবার ইনি কলিকাতায় পোষ্টেড। তখন কিছু কারনে আমাদের বরনগরের বাড়ী বিক্রি হয়ে গেল। শ্বশুর-শ্বাশুড়ী বুড়ো হয়েছেন সবাই তো নিজের নিজের কর্ম্মস্থলে আছে চাকরির জন্য। তাই আমরা সিঁথিতে ভাড়া বাড়ীতে গেলাম আর বাবা মা দুর্গাপুরে কেষ্টর (সেজ ঠাকুরপো) কাছে গেলেন তার বিয়ে হয়নি তখন, সে একা বলে তার কাছে গেলেন। একদিন আমি শুনলাম যে সীতারাম দাস ওঙ্কার নাথ ঠাকুর সকলকে দীক্ষা দিচ্ছেন, এদিকে আমি এনার উপর রাগ করে চৌরঙ্গী (আমার বর্তমান বাপের বাড়ী) গেলাম, বললাম আজ ফিরবো না। সেদিন রাত্রে বাবা শ্রী অবনী রঞ্জন সেনগুপ্ত, কাকা ডাঃ নলিনী রঞ্জন সেনগুপ্ত খেতে বসেছেন আমরা তাঁদের কাছে গিয়ে বসেছি, হ্যাঁ তার আগের দিন হঠাৎ ঠাকুর (গুরুদেব শ্রী সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ জী) চৌরঙ্গীতে বাবা-কাকার সঙ্গে দেখা করতে এলেন, সেদিন আর উপরে আসেননি আমরা সবাই ছুটে নিচে গেলাম ও প্রণাম করলাম। মা বললেন খালি হাতে সাধু দর্শন করতো নেই। এই নে কিছু ফল নিয়ে যা বলে আমার হাতে ফল দিলেন মা, বাড়ী শুদ্ধু সবাই গিয়ে প্রণাম করলাম। তারপর রাত্রে খেতে বসে কাকা বললেন, তোরা যে অতবড় সাধু দর্শন করলি, কি পেলি, মনে কি হোলো? সব শুনে মেজদি বললে আমরা দাদাভাইয়ের নাতনি বলেই ওই মহাপুরুষের দর্শন পেলাম আমাদের কত ভাগ্য, আর ন'দি বললে অনেক ভাগ্যে আপনাদের সন্তান হয়ে জন্মেছি বলে তাই পেলাম। ব্যাস শুধু এই? **আমায় বললেন তোর কি মনে হল? বললাম, কাকা মানুষে কত জনমের সুকৃতি থাকলে তবে ওই**

চরণে আশ্রয় পাওয়া যায় যাঁরা পেয়েছেন তাদের কত ভাগ্য। শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন কেনরে তোর এই কথা মনে হলো? তোর কি খুব দীক্ষা নেবার ইচ্ছা হেয়েছে? তুই তাহলে মধুসূদন স্বামীজীর কাছে নে না। সেই শুনে রমা পিসিমা বললেন মেজদা ওরা এখন ছেলে মানুষ কালীপদর বদলীর চাকরি কত জায়গা যেতে হবে ওকি অত নিয়ম মানতে পারবে? শ্রী বৈষ্ণবের খুব নিয়ম। তখন কাকা বললেন তবে মহা মিলন মঠে ঠাকুর যজ্ঞ করছেন তিনি পরশু রথের দিন দীক্ষা দেবেন শুনেছি। একবার আমার কাছে কালীপদকে আসতে বল। আমি একটি চিঠি লিখে দিচ্ছি সেই চিঠি ফিরে গিয়ে তাঁর হাতে দিতে বলবি মঠে যে থাকে তার হাতে যেন দেয়। আমি সিঁথির দিকে ডাকে যাবো তুই আমার সঙ্গে চল, আমার মনে মনে খুব আনন্দ হচ্ছে। বাড়ী গিয়ে তো এনার হাতে দিলাম। তখন বাবা বললেন ভাই কালীপদর নাম ও দেবীর নামটাও লিখে দাও। আমি তো বাড়ী এসে এনাকে বলতে ইনি তো আমায় খুব বক্‌তে লাগলেন বললেন তুমি নেবে নাও না আমায় কেন টানছো। আমি পারবো না, আমি বললাম কাকা তোমায় দেখা করতে বলেছেন, শুনে চুপ করে গেলেন। ইনি কোনোওদিন বাবা কাকার অবাধ্য হননি। এনাকে দেখে কাকা বললেন বাবা, শেষে অবলম্বন বড় দরকার তাই আমি তোমার নাম লিখেছি। এতে তোমার কিছু অসুবিধা হবে না। তারপর দিনই রথ। ইনি সেই রাত্রেই গিয়ে দেবীকে খবর দিলেন। শুনে দেবীর খুবই আনন্দ তখন বলছে আমায় এ সুযোগ কে করে দিতো আপনার জন্যই আজ আমার ভাগ্য ফিরলো।

-----x-----

মা ৺তারার দয়া

আমার সাল ও মাস কিছু মনে নেই, ইনি তখন কলিকাতায় পোস্টেড। একদিন অফিস থেকে এসে আমায় বললেন আমি কাল বক্রেশ্বর ও সাঁইথিয়া ইন্সপেকশনে যাবো। আমি তোমার সঙ্গে যাবো বললাম। তারাপীঠ দর্শন করবো শুনে বললেন আচ্ছা চলো। আমরা প্রায় ১০টা নাগাদ রওনা হলাম। আর গিয়ে পৌঁছলাম সন্ধ্যা হয়ে গেছে। গিয়ে উঠলাম একটা রেলওয়ের গেষ্ট রুমে। ওখানে অনেকগুলি এনার অফিসাররা আছে। আমরা স্নান সেরে ইনি চা খেলেন, আমি খাইনি আমি বললাম মাকে দর্শন না করে আমি কিছু খাবো না। তখন একজন সুপারিন্টেডেন্ট বললেন তাহলে একটা অটো আনি স্যার, আমরা তিন জনেই যাই। তখন এখনকার মত মন্দির সব ছিল না শুধু শশ্মানের মধ্যে মায়ের মন্দিরটাই ছিল আর অন্ধকারে ধুনী জালিয়ে কিছু সন্ন্যাসী মাংস গাঁজা খাচ্ছে। রাত্রে যেতে ভয় করে, মন্দিরে ঢুকবার আগে আমি মায়ের পূজার তিনটি ছোট ছোট ডালি নিলাম তখন কিছু পাওয়া গেলো না একটা জবার মালা পড়াবার খুব ইচ্ছা হচ্ছিলো আমার, মালা পড়ালে পূজা সার্থক হয় বলে আমি জানতাম। কোথাও মালা পাওয়া গেল না ইনি বললেন এখন এরকম জায়গায় মালা কোথায় পাবে, পরে বরং অন্য কোন মায়ের মন্দিরে গিয়ে মালা পরিও। আমার খুব মনটায় খারাপ লাগলো মনে মনে মাকে জানালাম মাগো আমি এ্যতো অধম একটা মালাও তোমায় পড়াতে পারবোনা, আমায় ক্ষমা করে তুমি কোথাও আমার কাছ থেকে মালা নিও মা, বলে

আমরা মন্দিরে ঢুকলাম মায়ের সামনে যে বেড়া দেওয়া আছে সেইখানে আমরা পর পর তিন জনেই দাঁড়িয়ে দর্শন করছি আর মনে মনে মাকে বলছি আমার সব অপরাধ ক্ষমা করে আমার পূজা নাও মা। আমি কাঁদছি আর মায়ের স্তব করছি। মন্দিরে অনেক মহিলারা আছে সবাই পূজা দিচ্ছেন। আমি হঠাৎ শুনলাম কে যেন ডাকছে "দেখো একবার এই দিকে দেখো" পিছন ফিরে দেখি আমাকে একটি মেয়ে ডাকছে, মেয়েটির বয়স মনে হল ২১/২২ বছর হবে হলদে রং লাল পাড় লাল ডুরে শাড়ী পরা কপালে বড় সিন্দুর টিপ চওড়া করে মাথায় সিন্দুর পরা। যেখান দিয়ে মন্দিরে ঢুকতে হয় খিলান মত আছে সেই খানে দাঁড়িয়ে হাতে একটি ঝুড়িতে কচু পাতা ঢাকা দেওয়া কি যেন নিয়ে আমায় ডাকছে "একবার এখানে এসো মা" বলে। আমি তাড়াতাড়ি তার কাছে গেলাম সে বলছে "আমার একটা উপকার করবে"? আমি বললাম বলো মা আমাকে দিয়ে যদি হয় নিশ্চই করবো তখন ঝুড়ি থেকে একটি "১০৮ জবার মালা বার করে বলছে এই মালাটা মাকে পড়িয়ে দেবে", আমি বললাম ওমা আমি তো এই মালাই খুঁজছিলাম কোথাও পেলাম না। মা দয়া করে তোমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। তুমি কোথায় থাকো মা? সে বললে আমি এইখানেই থাকি বাড়ীতে কুটুম এসেছিলো তো তাই সকালে আসতে পারিনি বলে আমার হাতে মালাটি দিলো আমি জিজ্ঞাসা করলাম পুরোহিতের হাতে দেবো? বলছে না তুমি নিজেই পড়িয়ে দাও আমি বললাম আমি ঠাকুর ছোঁবো? বলছে হ্যাঁ মা তো সকলের জন্যই, ভিতরে যাও ওর উপর দাঁড়াও

হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলো এমনি করে পড়াও। মনে মনে ভাবছি মা তোমার কত দয়া তুমি মা আমার হাত থেকে তাহলে মালা নেবে। আমিও ঢুকেছি মনে হলো কে যেন আমার পিছনে ঢুকলো আমি মালা পড়ালাম পিছন ফিরে দেখি সেই মেয়েটি মার চরণে আলতা দিচ্ছে কপালে সিন্দুর দিলো মুখে মিষ্টি দিল। দেখে আমার হঠাৎ মনে হলো তাইতো মেয়েটি তো মন্দিরে এলো তবে কেন আমায় মালা পড়াতে দিলো। যেই মনে হলো পিছন ফিরে দেখি আর মেয়েটি কোথাও নেই তখুনি এনাকে বললাম দেখোতো মেয়েটি কোথায় গেল, যে আমার পিছনে থেকে মাকে আলতা সিন্দুর পড়াচ্ছিলো অশ্চর্য্য নিমেষের মধ্যে মেয়েটি কোথায় গেল। ইনিও তাকে দেখেছেন তখুনিই মন্দির থেকে বেড়িয়ে কত খুঁজলেন কোথাও আর তাকে দেখা গেল না। আমার এ্যাতো কান্না আসতে লাগলো যে আমি এ্যাতোই পাপী মা নিজে এসে আমাকে মালা পড়াতে দিলেন। আলতা সিন্দুর পড়াতে হয় মুখে মিষ্টি দিতে হয় তাও দেখিয়ে দিলেন হাত দুটি যদি আমি চেপে ধরতাম মার। আমার এমনই কর্ম্ম যে কাছে পেয়েও চিনতে পারলাম না মাকে মন প্রাণ দিয়ে ডাকলে তাঁর কৃপা পাওয়া যায়।

-----x-----

গোপালের অলৌকিক দয়া

ইনি তখন এ্যাসিসটেন্ট কালেকটার জলপাইগুড়ি বদলী হলেন। আমি তখন এনার সঙ্গে যেতে পারিনি, কারন বুড়ো মানুষ আমার শ্বশুড় তখন আমার কাছেই ছিলেন, আর বড় বৌমার রাজা তখন ছোট্ট বাচ্ছা একা পারবেনা তাই যাইনি। তারপর বাবা স্বপনের কাছে কোলকাতায় চলে গেলেন আমার শ্বাশুরী তখন দুর্গাপুরে সেজ ছেলের কাছে আছেন, তারপর এনার খাওয়ার বড় কষ্ট হচ্ছিলো তাই আমি এনার সঙ্গে জলপাইগুড়ি গেলাম তখন ইনি খুব ট্যুরে যেতেন দার্জিলিং, শিলিগুড়ি। সপ্তাহে ৪ দিন দার্জিলিং শিলিগুড়ি থাকতেন আর ৪ দিন জলপাইগুড়ি থাকেন। অফিসে একটি মেয়ে ইন্সপেক্টর ছিল সে অবসর সময় খুব আমার কাছে আসতো। সে একদিন এসে বললে দিদি আমার সঙ্গে শিলিগুড়ি যাবেন, কাল অমাবস্যা আছে। আমার মেয়ের স্কুলের বন্ধু সে আপনার কথা আমার কাছে শুনে খুব করে আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছে। মেয়েটি খুবই দুঃখী সে মামার বাড়ী থাকতো বাবা মা দুজনেই মারা যান তাই বাধ্য হয়ে থাকতো মামার বাড়ী তার মামী খুব কষ্ট দিতো (তারা ৩টি ভাই বোন) একদিন খুব দুঃখ হয়েছে কাঁদছে আর মা কালীর ছবির দিকে তাকিয়ে বলছে হয় আমাদের মেরে ফেলো না হয় অন্য কোথাও নিয়ে চলো। তারপর **একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখছে মা বলছেন আমি এখানে আছি আমায় নিয়ে যানা,** ও বলছে আমি কোথায় থাকবো তার ঠিক নেই তোমাকে আমি নিয়ে

আর কি কোরবো ? আমি পারবো না মা, এই রকম বার বার দেখেছে। **একদিন রাত্রে দেখছে মা কালীর ভীষণ রূপ ধরে বলছেন এখুনি বাড়ী থেকে বেরো,** ও বলছে আমরা কোথায় যাবো ? **মা বলছেন সোজা সামনে দিকে হেঁটে যা পরে বলছি,** তখন ছোট ভাই বোনকে নিয়ে রাত্রে চুপি চুপি বেড়িয়ে গেল, একটা মাঠের মধ্যে তিন জনে গিয়ে বসলো তারপর সকালে মামা খুঁজতে খুঁজতে তিন জনকে দেখতে পায় বাড়ী নিয়ে যাবার জন্য অনেক বললো কিছুতেই গেলো না তারা। মেয়েটির নাম বিভা দত্ত তার বোনকে একজন খেলা করার জন্য পিতলের একটি কালী মূর্ত্তি দিয়েছিলো, মেয়েটি বি.এ. পাশ করেছিল, অনেক জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে একটি চাকরি পেল। প্রথমে দরমার ঘর করলো, ভাই বোনকে পড়াল, ভাই রাস্তায় ফেরী করতো এই করে মানুষ হলো। বিভার অফিসের বড়বাবুও সে একই রাত্রে দেখছে, **মা কালী বলছেন আমি কাশীতে আছি আমায় নিয়ে যা** পরদিনই দুজনে বড়বাবু ও সে নিজে কাশী যাত্রা করলো, গিয়েই প্রথমে মূর্ত্তির দোকানে গেল একটি মূর্ত্তির দাম বলছে ১০০ টাকা বিভা বলছে ৮০ টাকা হলে আমি নেব তার বেশী আমি দাম দিতে পারছি না। প্রথমে লোকটা রাজী হয়নি দিতে তারপর রাত্রে যখন তারা ষ্টেশনে চলে এসেছে ফিরে চলে আসার জন্য তখন দোকানদার ছুটতে ছুটতে এসে বলছে আপনারা ওই মূর্ত্তিই নিয়ে যান ওই দামেই। এ মূর্ত্তিটা আমার সারা দিনে বিক্রি হলো না। ইন্সপেক্টর আমাকে ওই খানেই ওই বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিল। তখন সে কাঠের বাড়ী করতে পেরেছে। তার বাড়ীতে আমি ১ রাত্রি ছিলাম, তখন মেয়েটির

বয়স বছর ৩০ হবে। বিয়ে করেনি তার বাড়ীতে একটা কালো কুকুর পাহাড়া দিত রাতদিন, আমি নিজে দেখেছি। অমাবস্যা রাত্রে মায়ের পূজায় বসেছে বিভা, আমি আর অমিয় দত্ত (ইন্সেপেক্টর) দুজনেই তার কাছে বসেছিলাম আর বাইরে কিছু লোক পূজা দেখতে এসেছিল, আমি যখন শিলিগুড়ি গেলাম তখন আমার গোপালকে ঘরে রেখে সামনে দরজা বন্ধ করে বললাম যে ঠাকুর তোমার খাবার দিয়ে গেলাম তুমি খেয়ে নিয়ো। মুখে পরে আমায় জানিও ঠাকুর যে তুমি খেয়েছো, যেন না খেয়ে থেকোনা। তুমি না খেলে আমার খুব দুঃখ হবে। এই অধমের উপর এতো কৃপা আমার গোপালের আমায় ঠিক জানিয়ে দিলেন যে তিনি খেয়েছেন। যখন পূজা হচ্ছে তখন বিভার ভড় হয়েছে আমায় বলছেন মা দরজাটা বন্ধ করেদে তখন ঘরে আমি আর অমিয় আছি আমার দিকে তাকিয়ে দেখতো ভাল করে দ্যাখ, আমি দেখছি মায়ের সঙ্গে আমার গোপালের মুখ সেই রূপার মুকুট পড়া আমি বার বার চোখ মুছে দেখছি, দেখছি গোপালের মুখ তখন আমি কেঁদে ফেলেছি আর বলছি এই মহা অধমকে তোমার এ্যাতো দয়া ঠাকুর। তাই বলছি আমার শিশু বয়সের (পাঁচ বছর বয়স) ঠাকুর কিন্তু খেলার গোপাল নয় তিনি মন দিয়ে ডাকলে দয়া করেন।

-----x-----

মহাকাল দর্শন

১৯৭৬ সাল বৈশাখ মাস ছিল। আমার তখনকার তারিখটা ঠিক মনে নেই বারটা শুক্রবার ছিল, ইনি তখন জলপাইগুড়িতে পোস্টেড। ইনি জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়িতে কলাবাড়ী বাগান ইনেস্পেকশানে যাচ্ছিলেন তাই আমিও গেলাম আরো অফিসের এক হেড ক্লার্ক নাম শম্ভু মুখার্জ্জী, আর একজন সুপারিনন্টেডেন্ট তাঁর স্ত্রী ও মেয়ে (নাম আর.এন.দাশগুপ্ত) তারাও গেলেন। বাগানের ম্যানেজার খুব বেশী খাতির করলেন সেখানের চমৎকার গেস্ট রুমে আমাদের থাকার ব্যবস্থা, খাওয়া দাওয়াও অতি রাজকীয়। খুবই সন্মান, ম্যানেজারের স্ত্রী আমায় ডেকে তার বাড়ী নিয়ে গেল, খুবই খাতির, আমিতো নিরামিষ খাই তাই তার কাছে খেলাম না। পরদিন সকালে ইনি গেলেন মঙ্গলকাটা বাগানের কাজ দেখতে। **আমি বললাম আমার জন্য গাড়ীর ব্যবস্থা কর ও লোক দাও আমরা যাব মহাকাল দর্শন করতে; শুনেছি ভূটান পাহাড়ের গুহার মধ্যে মহাকাল আছেন আমরা দেখতে যাব।** ইনি বললেন ভয়ানক দুর্গম রাস্তা তুমি পারবে না আর আমার যাবার সময় নেই। আমি যাবো না আমার অনেক কাজ আছে। সবাই শুনে বলছে যে, সে ভয়ানক দূর্গম বোধ হয় আপনারা যেতে পারবেন না আমি খুব জোড় করলাম। আমি বললাম যে করেই হোক আমি যাবই এতোদূর এসে অমন জায়গা না দেখে বাড়ী ফিরবো না। পরদিন সকাল ৮টায় ইনি অফিসের বড়বাবুকে (শম্ভুনাথ

মুখার্জী) বললেন আপনি নিয়ে যান, ইনি সকাল ৮.৩০মিনিটে আমাদের জীপ পাঠিয়ে দিলেন। আমরা পাঁচজন মিলে যাত্রা করলাম। আমি, শম্ভুবাবু, দাশগুপ্তর স্ত্রী (মিসেস সুপারিনটেন্ডেট) ও মেয়ে, আর ম্যানেজারের স্ত্রী। ভদ্রমহিলা অসম্ভব রকমের মোটা উঠতে বসতে কষ্ট হয় তিনি একা সামনে বসে সমস্ত সিট্‌টা জুড়ে ফেললেন, বেচারা ড্রাইভারের বসতেও বেশ অসুবিধা হচ্ছিল। বেশ খানিক দূর যাওয়ার পর পাহাড় মরা নদীর উপর দিয়ে গাড়ী যাচ্ছে ভীষণ লাফাচ্ছে তখন ৮ কি ১০ মাইল গিয়েছি আমরা, দাশগুপ্তর স্ত্রী মেয়ে বলছে আর যাওয়ার দরকার নেই। গেলে বোধ হয় আমরা ফিরতে পারবো না একি ভয়ানক রাস্তা আমাদের আর তিন জনের ইচ্ছা যাই তাই আমরা এগিয়ে গেলাম। তারপর এক জায়গায় গাড়ী থামলো, ড্রাইভার বললে আর গাড়ী যাবার রাস্তা নেই। আমরা গাড়ী থেকে নেমে পড়লাম। কোন দিকে যেতে হবে আমরা কেউই পথ জানি না, সে রাস্তায় কোনে বসতি বা মানুষজনও নেই। দাশগুপ্তর মেয়ে ও স্ত্রীর ভীষণ কষ্ট হতে লাগলে বললে আমরা আর যাবনা গাড়ীতেই থাকবো বসে আমার পেটে ব্যাথা হয়ে গেছে। আমরা তো সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আরো কিছু দূর গিয়ে দাশগুপ্তর স্ত্রী বললে আপনারা যান আমি এই টিলাটার উপর বসে থাকি আমি আর হাঁটতে পারছিনা। আমরা তিনজনে চলতে লাগলাম কোন দিকে যাবো কিছুই জানি না তবুও সামনে যে রাস্তা মত মনে হচ্ছে এগিয়ে যাচ্ছি পাহাড়ের উপরেই উঠছি চলেছি ত চলেইছি তার বুঝি আর শেষ নেই কোনোও জনপ্রাণী নেই। কাকপক্ষীও নেই কাকে রাস্তা

জিজ্ঞেস করব, বিকেল হয়ে এসেছে, ভয়ও করছে কত পাহাড় উঠছি নামছি শম্ভুবাবু বললেন আপনারা এগিয়ে চলুন আমি মিসেস দাশগুপ্তকে গাড়ীতে বসিয়ে আসি তারা মেয়ে এক জায়গায় আর মা আর এক জায়গায় এটা উচিত নয়। শম্ভুবাবুও নেমে গেল তাদের এক জায়গায় করতে, খালি আমি ও ম্যানেজারের স্ত্রী এগিয়ে চলেছি ভীষণ মোটা মানুষ হাঁপিয়ে একাকার হচ্ছে আর আমায় বলছেন দিদি আমার ভাগ্যে বোধহয় দেখা হবে না, আমি বললাম ওকথা বলবেন না সবাই আমার সঙ্গে শিবের স্তব পাঠ করুন। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে স্তব পাঠ করতে লাগলাম ও জোরে মুখে জয় গুরু জয় গুরু বলুন আমি সর্বদা মুখে জয় গুরু জয় মহাকাল দর্শন দাও ঠাকুর চেঁচিয়ে বলছি সমস্তক্ষণ গুরুনাম করেছি যেতে যেতে ভদ্র মহিলা এক পাহাড়ি ছোটো নদী অল্প জল সরু হয়ে বয়ে যাচ্ছে খুব স্রোত এক বড় নুড়িতে পা দিয়ে ধপাস্ করে পড়ে গিয়ে গড়িয়ে গেলেন আর একটা পাহারে ধাক্কা খেলেন খুব লেগেছে কোথায় চটি গেলো কোথায় চশমা ঠিক নেই আমি একটু এগিয়ে গেছি পড়ার আওয়াজেই তাকিয়ে দেখি তিনি উপুর হয়ে পড়ে গেছেন। আমার মাথাঘুরে গেছে। কি করে ওনার ওই বিশাল শরীর টেনে তুলবো আর তো কেউ কোথাও নেই, জন মানব শূন্য জায়গা। এসে তাকে টেনে তুললাম সমস্ত কাপড় চোপড় ভিজে গেছে ঠাকুর খুব রক্ষা করেছেন যে তাঁর হাত পা কিছুই ভাঙেনি আমি তার চটি চশমা খুঁজে নিয়ে এলাম। তারপর পাহাড়ের গায়ের জঙ্গল থেকে দুটো গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে এলাম একটা ভদ্র মহিলার হাতে দিলাম আর

একটা আমি নিলাম। বললাম দিদি এই লাঠি ভর করে চলুন যেতে অনেক সুবিধা হবে আমি শুনেছিলাম দুর্গম পথে লাঠি নিয়ে চললে অনেক সুবিধা হয় চলার। এমন সময় শম্ভুবাবু ফিরে এলো তাকে গাড়ীতে বসিয়ে রেখে। তারপর আমরা আরো অনেক দূর উঠছি আমার মন খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে এ্যাতে কষ্ট করে এসেও কি তোমার দেখা পাবোনা ঠাকুর আমাদের পথ দেখিয়ে দাও। পরে ঠাকুর আমার কাতর প্রার্থনা শুনলেন একটা পাহাড় থেকে দেখছি নদী নিচের দিকে নেমে গেছে ভীষণ খাদে ওই রকমই নদী ছিরছির করে জল যাচ্ছে তার উপর একটা বড় পাথরের উপর একটা কুকুর পা লম্বা করে শুয়ে আছে শম্ভুবাবু বললেন বোধ হয় ওইখান দিয়ে গিয়ে ওই পাথরটায় উঠতে হবে আমি বললাম চলুন আমরা মহাপ্রস্থানের পথেই চলেছি তাই মহাদেব আমাদের কুকুর পাঠিয়ে পথ দেখাচ্ছেন। সেই পথে আবার একটা খুব খরস্রোতা নদী সেটা টপকে আমরা সেই খাদে নামলাম। আর প্রাণভরে তিনজনে ঠাকুরকে ডাকছি। সামনের পাহাড়ের ওপর যেতে হবে, উঠেও কোনো গুহা দেখতে পাচ্ছিনা তখন কি করবো বুঝতে পাচ্ছি না ঠিক এমন সময় যেন ঠাকুর পাঠিয়ে দিলেন উপরের পাহাড় থেকে একটি পাহাড়ী যুবতী ভূটিয়া মেয়ে পীঠের দিকে একটা বড় বোঝা নিয়ে তর তর করে নেমে আসছে আমি ছুটে গিয়েই তার সামনে রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে বলছি আমায় মহাকালের পথ দেখিয়ে দাও, তুমি আমাদের সঙ্গে চলো সে কিছুতেই যাবেনা, সে বলছে নেহি তুম হট্ যাও হাম জায়গা। তখন আমার কাছে ৫০ টাকা ছিল। তখুনি টাকাটা বার

করে বললাম এই নাও আমায় রাস্তায় নিয়ে চলো। টাকা নিয়ে থমকে দাঁড়াল ও তবে রাজী হলো সে আমাদের সঙ্গে চলল বলছে "আও মেরে সাথ"। সে যে কি দুর্গম রাস্তা বলে বোঝাতে পারিনা আমার তখন মনে হচ্ছিল এই মেয়েটিকে মহাকাল আমাদের পথ দেখাবার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন। কত দয়া ঠাকুরের। সেই মেয়েটি আমাদের মহাকাল পূজারীর বাসায় নিয়ে গেল আর যেতে রাজী হলো না। পূজারীর বৌকে দেখলাম ছেলে মানুষ, বাচ্ছার কাঁথা কাচ্ছে আমরা বলায় সে বললো এ্যাতো দূর থেকে এসেছেন এ্যাতো বড় তীর্থ না দেখে ফিরে যাবে চলো তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি। সে তখন আমাদের আরো কিছু উঁচুতে মহাকলের গুহায় নিয়ে গেল, তাকে সামান্য কিছু টাকা দিলাম। ওরাতো ভীষণ গরীব। গিয়ে দেখে যেন আত্মহারা হয়ে যেতে হয়। আমার এ্যাতো ভাল লাগলো একটা ছোট পাহাড়ের ওপর বড় পাহাড়ের গুহা তার মধ্যে বড় ছোট পাথরের জট সেই জট থেকে ঝর ঝর করে জল পড়ছে দেড় হাত মত কালো পাথরের শিব লিঙ্গের মাথায় তাঁর গায়ে পাথরের সাপ জড়ান দেখে মনে হচ্ছে যেন মহাদেব জটা খুলে দাঁড়িয়ে আছেন আর গুহার ডান পাশে পাথরের হর-পার্ব্বতী রয়েছেন। ইনি স্বয়ম্ভু কেউ এনে তৈরী করেনি। সে কি দেখলাম মনে হচ্ছিল বুঝি কৈলাশ ধাম এলাম পথ চলার যে অত কষ্ট আর একটুও থাকে না। আমি আমার সময় পাহাড় থেকে বুনো ফুল তুলে এনেছিলাম সেই দিয়ে ছেলে, মেয়ে, বৌ, নাতির নামে পূজা দিয়ে পূজারীর সঙ্গে আমরা তিন জনে আবার নেমে এলাম তখন প্রায়

সন্ধ্যা হয় হয়। ৬টা নাগাদ আমরা ফিরলাম আকাশের অবস্থাও তখন ভাল নয় বুঝি বৃষ্টি নামে। বৃষ্টি নামলে পাহারের রাস্তা আর চলা অসম্ভব। এদিকে গাড়ীতে এরা মা ও মেয়ে ভীষণ চিন্তায় আকুল হয়ে পড়েছে ভেবেছ আমাদের বুঝি বিপদ হয়েছে কি পাহাড়ের রাস্তা হারিয়েছি আর ফিরতে পারব না। আমাদের দেখে তখন আস্বস্ত হয়। তার মধ্যে আমাদের আসতে অত দেরী দেখে ইনি ও কলবাতীর ম্যানেজার চারিদিকে টেলিফোন করে, গাড়ী ও লোক পাঠিয়ে একাকার করছেন, চিন্তায় খুব অস্থির। এমন সময় আমরা মহাকালের অসীম কৃপায় সুস্থ্ শরীরে দর্শন করে ফিরে এলাম তখন রাত্রি ৮টা বাজে। আমায় একটু বকলেন, তারপর সব শুনে খুশি হলেন।

-----x-----

দার্জিলিং ভ্রমণ

গত ২৬শে এপ্রিল আমরা দার্জিলিং গেলাম, সেখানে এক সুপারিন্টেনডেন্ট এর বাড়ী আমরা উঠলাম। আর ইন্সপেক্টর অনল চৌধুরী সস্ত্রীক আমাদের সঙ্গে ছিল তারা একটা হোটেলে উঠলো। ভীষণ বৃষ্টি আর মেঘ খুবই অসুবিধা হচ্ছিল ভয়াণক শীত। তাতেও আমরা মধ্যে মধ্যে বেড়িয়ে কিছু কিছু দেখেছি ম্যালে বেড়াতে গেলাম সেখান থেকে মহাকাল দেখলাম তারপর দেশবন্ধু সি.আর. দাসের বাড়ী যেখানে তিনি মারা গিয়েছেন সবই সাজান আছে, তাঁর বিছানা ও ব্যবহারিক জিনিষ কিছু কিছু দেখলাম। তারপর দিন বটানিক্যাল গার্ডেন দেখলাম ভিক্টোরিয়া ফলস্ দেখলাম তারপর দিন ২৮শে এপ্রিল আমরা জলপাইগুড়ি ফিরছি। মিরিক হয়ে আসছি, মিরিক লেক দেখলাম। বাতাসি লুপও আগের দিন দেখেছি। এই ম্যানেজারের বাড়ীতে চা ইত্যাদি খেয়ে বাগান দেখে আমরা ফিরে এলাম বড় সুন্দর পাহাড়ের দৃশ্য প্রকৃতির শোভা অপূর্ব সেখানে।

-----x-----

শ্রী কামাক্ষা মাতা দর্শন

আমরা আজ ৩০শে জুন জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি এলাম সেখান থেকে ৺কামাক্ষা ধাম রাত্রের ট্রেনে রওনা হবো। শিলিগুড়ি অফিসে এনাকে ফেয়ার ওয়েল দিলো। একটা সুন্দর ঘড়ি দিয়েছে। ১লা জুলাই আমরা সকাল ৭টার সময় এসে গৌহাটী পৌঁছলাম। স্টেশন থেকে বেড়িয়েই ট্যাক্সি পেলাম সোজা মন্দিরের কাছে নামলাম পান্ডা নিয়ে আমরা গেলাম মন্দিরে, মুখ হাত ধুয়ে, সৌভাগ্য কুণ্ডে পূজা করে গিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। খুব ভাল করে মায়ের দর্শন ও পূজা করলাম তারপর কুমারী পূজা করলাম সব শুদ্ধ পূজা বাবদ পান্ডাকে ৩২্ টাকা দিলাম আর তার দক্ষিণা বাবদ দিলাম ১৫্ টাকা। আমি কিছু মায়ের ছবি কিনলাম তারপর আর একটা পাহাড়ে গেলাম ভুবনেশ্বরী দর্শন করতে সেখানে মায়ের কপাল আছে, পাথর হয়ে আছে। কোন মূর্ত্তি নেই কামাক্ষায় মায়ের নিম্ন অঙ্গ পড়েছে। একটা একটু উঁচু করা পাথরে লাল কাপড় দিয়ে ঢাকা তার তলা দিয়ে একটু একটু ছির ছির করে জল আসছে সেইটিই হল মায়ের যোনি পীঠ তারপরের সামনের ঘরটিতে হর পার্ব্বতীর মূর্ত্তি সিংহাসনে বসান আছে। সেখানে মায়ের মূর্ত্তি ৬ মুখ ১২ হাত সিংহের পিঠে শবরূপী মহাদেব তার উপরে পদ্মাসনে অধিষ্ঠিতা মায়ের মূর্ত্তি পিতলের বলেই মনে হলো।

-----x-----

দক্ষিণ ভারত দর্শন

তিরুপতিনাথ, শ্রীরঙ্গনাথজী ও শ্রী মীনাক্ষী মাতা দর্শন

আজ ১২ই মাঘ ১৩৮১, ইং ২৬শে জানুয়ারী ১৯৭৫, রবিবার

আজ ১২ই মাঘ ১৩৮১, হাওড়া থেকে আমরা মাদ্রাজ যাত্রা করলাম ৬.৩৫ মিনিটে ট্রেন ছাড়লো। পরের দিন ভোর থেকে রাস্তার সুন্দর দৃশ্য দেখছি ২৭শে জানুয়ারী দুপুরের দিকে গোদাবরী নদী পার হলাম মস্ত বড় সেতু সুন্দর দেখতে। আবার বিকালের দিকে কৃষ্ণা নদী পার হলাম সেও খুবই সুন্দর। আজ ২৮শে জানুয়ারী ভোর ৫টায় এসে মাদ্রাজে পৌঁছালাম আবার ৭টার ট্রেনে আমরা তিরুপতি যাত্রা কচ্ছি। বেলা ১টার সময় আমরা তিরুপতি এসে পৌঁছলাম। একটা কটেজ পেয়ে গেলাম ১০্ টাকা ভাড়া এক রাত্রে। স্নান সেরে গেলাম গাইড নিয়ে মন্দির দর্শন করতে। দর্শন পেলাম তিরুপতি নাথের। ভগবান বালাজীর দর্শন করে আমার মন ভরে গেল মনে হতে লাগলো যেন বৈকুণ্ঠ পুরী এলাম মন্দিরের যে দিকে তাকাই সেই দিকেই দেখি নানা ভগবানের মূর্ত্তি দশ অবতার লক্ষ্মী নারায়ণ, সীতারাম, রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি বহু দেবতার মূর্ত্তি অপূর্ব মন্দির যেন একটি ছোট শহর। যখন পাহাড়ের গা দিয়ে রাস্তা দিয়ে ঘুরে ঘুরে বাস যাচ্ছিল কি সুন্দর যে শোভা বলে বর্ণনা করার ক্ষমতা আমার নেই। আমার উপর গুরু দেবের এ্যাতো দয়া যে ওই ভাবে বাসে ঘুরে ঘুরে বাস উঠছিল উপরে আমার শরীর একটুও খারাপ লাগেনি। আজ ২৯শে জানুয়ারী

সকাল বেলায় ৬টার সময় আবার মন্দিরে গেলাম ভগবান দর্শনের জন্য গিয়ে লাইনে দাঁড়ালাম দর্শন করে ফিরে আসতে প্রায় ২।।. ঘন্টা (আড়াই ঘন্টা) সময় লাগলো। তারপর সোজা বাসে করে মাদ্রাজ এলাম, পৌঁছলাম ২টার সময়। ভীষণ খিদে পেয়েছে আমাদের তখন হোটেলে ইডলি-ধোসা খেলাম তারপর স্টেশনে ঘুরতে লাগলাম লক্‌রুমে মাল রেখে আবার রাত্রে ট্রেন ধরে ত্রিচুরাপল্লি যাব শ্রীরঙ্গম দর্শনের জন্য। ৫।।. টায় (সাড়ে পাঁচ) মাদ্রাজ হোটেলে খেলাম ঢাকাই পরটা, আইস ক্রিম, ক্ষীর চা ইত্যাদি খুব ভাল খেলাম। মাদ্রাজ শহর মনে হচ্ছে যেন কলিকাতায় এলাম সুন্দর শহর খুব পরিস্কার শহর। তিরুপতি নাথের মন্দিরের শোভা বর্ণনা করতে পারিনা সমস্ত মন্দির রূপায় সোনায় ভরা রাত্রে চাঁদের আলো আর লাইটের আলোয় অপূর্ব সুন্দর চোখ ফেরাতে ইচ্ছা করে না। তিরুপতি নাথের দুই পাশে লক্ষ্মীজী ও পদ্মাজী তাঁর দুই পত্নী দাঁড়ানো মূর্ত্তি সোনার গহণায় ঠাকুর ভরে আছেন। চতুর্ভূজ নারায়ণ মূর্ত্তি কালো পাথরের আর লক্ষ্মীজী ও পদ্মাজী মনে হলো পিতলের কি অষ্টধাতুর। জয় বিজয় গরুড় রামানুজ স্বামী সবই আছেন দেখলাম। কিন্তু তিলকে সব ঠাকুরের চোখ ঢাকা তাঁর দৃষ্টী নাকি যে দিকে পড়বে সব ভস্ম হয়ে যাবে তাই। শুক্র শনি ও রবিবার প্রচণ্ড ভীর হয়। এ্যতো টাকা মন্দিরে পরছে সোনা রূপা ইত্যাদি সব আমি জীবনে দেখিনি। মনে হলো প্রায় রোজ ১৫/২০ হাজার টাকা করে ঠাকুরের শুধু পূজা পরে। সেখানের সবই তিরুপতি নাথের স্টেটের ১৫০টা বাস পাহাড়ে উঠা নামা করে সবই তিরুপতি নাথের।

তিরুপতি ষ্টেশন থেকে মন্দির ১২ কিলোমিটার রাস্তা ৮০০০ হাজার ফুট উঁচু পাহাড়।

আজ ১৬ই মাঘ, ১৩৮১, ইং ৩০শে জানুয়ারী ১৯৭৫, বৃহস্পতিবার ভোর ৫টা ১০মিঃ এসে ত্রিচুরাপল্লিতে নামলাম এসে কাঞ্চন হোটেলে উঠলাম স্নান সেরে সামান্য চা বিস্কুট খেয়েই বেরোলাম শ্রীরঙ্গমের পথে বাসে করে কাবেরী নদী পার হয়ে গেলাম ৮ মাইল পথ। নদীর পূর্ব দিকে শ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দির। এও খুবই সুন্দর ও প্রকাণ্ড মন্দির অনেক দিনের পূরানো মন্দির। শ্রী অনন্ত শয়নে শয়ান চতুর্ভূজ নারায়ণ মূর্ত্তি পাশে লক্ষ্মীজীর তিন মূর্ত্তি শ্রী, ভূমি, নীলা দেবী আছেন। রঙ্গনাথজীর দর্শনের বড়ই আকাঙ্খা মনে ছিল আমার, ঠাকুর তা পূর্ণ করলেন। প্রকাণ্ড বড় মূর্ত্তি, মন্দির চুড়া সমস্ত সোনার। রূপার ও পিতলের সিং দরজা, নারায়ণের শ্রীচরণ হাত সব সোনার, মা লক্ষ্মীর মাথার হীরার মুকুট সব পরান চমৎকার। পুরোহিতেরা বড়ই টাকার জন্য পেড়াপিড়ি করে আবার ফিরলাম ত্রিচুরাপল্লি আজ এখানেই বিশ্রাম করবো। খুব পায়ে ব্যাথা হয়েছে কাল রাত্রে সারা রাত ইনি জেগে এসেছেন ট্রেনে জায়গা পাওয়া যায়নি। কাল ভোরের ট্রেন ধরে মাদুরাই রওনা হবো। ত্রিচুরাপল্লিতে রাস্তার ধারে একটা বাগান দেখলাম ভারী চমৎকার দেখতে গাছ দিয়ে মানুষ, হাতি, কাঠবেড়ালি, সাপ, ইঁদুর ইত্যাদি করা ভারী সুন্দর দেখতে বাগানটা রাস্তার পাশে।

শ্রীরঙ্গমের মন্দিরের গায়ে কত দেব দেবীর মূর্ত্তি করা কাজ সব খুবই চমৎকার। মন্দির সব জায়গায়ই শুধু পাথর কেটে কেটে করা। এখানে শ্রীরাঘবেন্দ্র স্বামীর সমাধী ও মূর্ত্তি মতন পাথরের মন্দির করা আছে দেখলাম।

আজ ৩১শে জানুয়ারী, দুপুরের সময় মাদুরাই এসে পৌঁছলাম এসেই উঠলাম রাধাকৃষ্ণ লজে এখানে সব জায়গায় থাকার ঘর। হোটেলে গিয়ে খেতে হয়, গিয়ে খেলাম এদেশের খাওয়াই খেলাম আমাদের খুব খারাপ লাগছেনা খেতে ভাত খুব চমৎকার। আমি ভাত সব জায়গায় খাইনি (ব্রাহ্মণ হোটেল ছাড়া) বিকালের দিকে গেলাম মন্দির দর্শনে মাথা পিছু ১্ টাকা করে টিকিট আর পূজা ৩.৫০ পয়সা মন্দির অপূর্ব সুন্দর তুলনা হয়না। শ্রী মিনাক্ষী মাতার দর্শন পেলাম, লাইন দিয়ে যেতে হয় খুবই ভাল দর্শন হয়েছে। মন্দির ঘুরে দেখতে আমাদের ২।।. (আড়াই) ঘন্টা সময় লেগেছে। মায়ের মূর্ত্তি সুন্দর কালো পাথরে সমস্ত অঙ্গ সোনা দিয়ে ঢাকা দাঁড়ান মূর্ত্তি দুই হাত, দুর্গা মূর্ত্তি হীরার মুকুট বেশ বড় মাথায় টোপরের মত। সমস্ত অঙ্গে সোনার হীরার ইত্যাদির গহনা পরান বেনারসী শাড়ী পড়ান। পরের মন্দিরটিতে শিবের মূর্ত্তি আছেন কালো পাথরের লিঙ্গ এরও সব সোনা রূপা দিয়ে মোড়া মাথায় বেশ বড় সোনার সাপের মুকুট তাতে হীরা ও অনেক রকম উজ্জ্বল পাথর দিয়ে কাজ করা ও ঝুলছে মুখে। এক জায়গায় মন্দিরের মধ্যে হর পার্ব্বতী রূপার দোলনায় দুলছেন ছোট মূর্ত্তি খুব চমৎকার মূর্ত্তি খুব বেশি গনেশজীর মূর্ত্তি আছে। মস্ত রূপার ষাঁড় তার উপর সোনা রূপা দিয়ে মহাদেবের মূর্ত্তি বসান তাঁকে অনেক

জন মিলে তুলে নিয়ে মীনাক্ষী মাতার কাছে ঘুরিয়ে নিয়ে আসে রোজ সন্ধ্যা বেলায় বড়ই চমৎকার। মন্দির একবার দেখে আস মেটেনা সব মন্দিরেরই মাথার চূড়া পুরা সোনার।

শ্রী কার্ত্তিক সুব্রমন্যম দর্শন

১৮ই মাঘ ১৩৮১, ইং ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫ শনিবার

আজ ১৮ই মাঘ ১৩৮১ আমরা সকালে লেক দেখলাম, বেশ ভাল দেখতে। তারপর আবার অন্য বাসে করে তিরুপুরম্‌কুন্ড্রম গেলাম যেখানে কার্ত্তিকের মূর্ত্তি দেবসেনা কার্ত্তিক শুব্রমন্যম নামে অভিহিত ময়ূরের চুঁড়া কালো পাথরের মূর্ত্তি চার হাত দুই পাশে দুই স্ত্রী আছেন। এঁর কপালে অনেক একসঙ্গে করা হীরা ঝক্ ঝক্ করছে। লেকের পাশে ভগবতী মাতা মন্দিরও দেখলাম এখানেও সোনা রূপার গহনা সিংহাসন ইত্যাদি তবে অনেক কম। অন্য মন্দিরের তুলনায় ছোট মন্দির এটি। এই মাদুরাইতে অনেক মন্দির আছে। মিনাক্ষী মাতার মন্দির গুলির মাথা উচ্চতা প্রায় ১৫ তলা বাড়ীর সমান হবে।

শ্রী কন্যাকুমারী ও বিবেকানন্দ রক্ দর্শন

১৯শে মাঘ ১৩৮১ ইং ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫ রবিবার

আজ ১৯শে মাঘ ১৩৮১, গতকাল রাত্রি ১১টায় ট্রেন ছাড়লো আর আজ ভোর ৪টায় এসে পৌঁছলাম টিনেভ্যালি স্টেশনে সেখান থেকে ৬টায়

বাসে করে এলাম আমরা নগর কোয়েল বলে একটা বাস স্টেশনে সেখান থেকে বাস বদল করে এলাম আমরা সকাল ৯টার সময় কন্যাকুমারী। এসে উঠলাম ভগবতী লজে, রাতে ইনি ঘুমাতে পারেননি শরীর খুব ক্লান্ত স্নান সেরে নিজেরা চা করে খেলাম, দুধ দৈ কিনলাম চিঁরা দিয়ে খেয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুমিয়ে উঠে বিকালের দিকে গেলাম বিবেকানন্দ রকে লঞ্চে করে যেতে হয়। খুব ভাল লাগলো মন্দিরটা দেখে প্রকান্ড দাঁড়ান স্বামী বিবেকানন্দের ব্রোঞ্চের মূর্ত্তি আছে রামকৃষ্ণ শ্রীমার অয়েল পেন্ট করা খুব বড় ছবি। আর কুমারী মাতা ওই রকটিতে বসে শিবের জন্য তপস্যা করেছিলেন তাঁর একটি চরণ আছে। মন্দিরটি সমুদ্রের মধ্যে দেখতে খুবই চমৎকার। তারপর সেখান থেকে বেড়িয়ে গেলাম কুমারী মাতার দর্শনে তখন বিকাল ৫।।. (সাড়ে পাঁচটা) বাজে মায়ের মন্দির খুললো। গেলাম আমরা মন্দিরে ১.৫০ পয়সা করে মাথা পিছু টিকিট আর মায়ের পূজা ১.৫০ টাকা ডালি নিয়ে পূজা দিতে গেলাম। মায়ের মূর্ত্তির তুলনা করা যায়না দাঁড়ানো দেবী মূর্ত্তি দ্বিভূজ কুমারী দুর্গা মাতার মূর্ত্তি এক হাতে মালা ও অন্য হাতে অভয় একটি ছোট ১০ বছরের মত মেয়ের মূর্ত্তি কালো পাথরের ঠাকুর মুখটিতে মোটা করে চন্দন দিয়ে লেপে মুখটি তৈরী করা বেনারসী শাড়ী পড়ান সোনায় ও হীরার গহনা মায়ের অঙ্গ ভরা বড় ভাল লাগলো মাকে দর্শন করে। আমি সব ঠাকুরেরই ছবি প্রতি জায়গা থেকেই অনেকগুলো করে নিয়েছি। সমুদ্রের শোভা বর্ণনা করার ক্ষমতা আমার নেই ঢেউগুলি অত্যন্ত ভাল দেখতে কবি যে লিখেছেন (বেলারে দিতেছে সিন্ধুশ্বেত

পুষ্প হাড়) সত্যিই তাই মনে হয় দেখলে। আমার ছেলে মেয়েদের জন্য খুব মন কেমন কচ্ছে এই সব যত দেখছি জানিনা তারা কবে দেখতে পাবে। সমুদ্র দেখছি আর আমার নান্তুকে কেবলই মনে হচ্ছে কত দূরে এই সমুদ্রের বুকে গ্যেছে বাছা। ঠাকুরের কৃপা আমাদের উপর অসীম যেখানেই অসুবিধা হয়েছে বা হবে কে যেন আগে থেকেই সাবধান করে দিচ্ছে।

২০শে মাঘ ১৩৮১ ইং ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫ সোমবার

আজ ১৯শে মাঘ ১৯৮১ আবার বিকালে বিবেকানন্দ রকে গেলাম গিয়ে ধ্যান মণ্ডপে কিছুক্ষণ বসে একটু ঘুরে বেড়িয়ে এলাম এসে আবার মন্দিরে গেলাম আবার মাকে দর্শন করতে। দর্শন পেলাম একেবারে সামনে গিয়ে। প্রদীপের আলোয় মার নাকের বড় দুটি হীরা খুব বেশি জ্বলছে মন্দিরের ভীতরে লাইটের আলো নেই সবই প্রদীপের আলো খুব অন্ধকার। কাল আমরা সকাল ৮টার বাসে করে রামেশ্বরম যাত্রা করছি।

২১শে মাঘ ১৩৮১ ইং ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫ মঙ্গলবার

আজ ২০শে মাঘ ১৩৮১ সকাল ৮ টার বাসে উঠে আমরা মণ্ডপমে্ এসে পৌঁছলাম। বিকাল প্রায় ৪টার সময় আবার সেখান থেকে ট্রেনে করে ব্রিজের উপর দিয়ে সমুদ্র পেড়িয়ে শ্রীরামেশ্বরম আসতে হয়, এসে পৌঁছলাম ৫টার সময়। প্রচন্ড ভীর, শ্রীরামেশ্বর দেবের মন্দির বন্ধ ৬ দিন ধরে সেখানে কুম্ভ যজ্ঞ হচ্ছে প্রকান্ড মণ্ডপে অনেকগুলি যজ্ঞ কুণ্ডতে পুরোহিতরা আহুতি

দিচ্ছেন সারা রাতই হচ্ছে। এই যজ্ঞ দেখতে পরদিন ভোর থেকেই গেলাম মন্দিরে ১০্ টাকা করে জন প্রতি টিকিট কাটলাম। নিয়ে গেল মন্দির চত্বরের তিন তলার উপর সেই খানে বসে সমস্ত মন্দিরগুলির মাথা পর্য্যন্ত দেখা যায় আমরা বসে দেখলাম খানিকক্ষণ তারপর নেমে এলাম। মন্দিরের ভীতর অত্যন্ত বড় অনেকগুলি থাম করা করা, ছোট বড় পুতুল করে করে রামায়ণের কাহিনি তৈরি করা আছে। আর একটি জায়গায় শয়ান নারায়ণ আর শ্রীদেবী পদ্মাদেবী আছেন খুব ভাল লাগলো দেখে। গনেশজী, সন্তোষী মাতা আছেন, রামেশ্বর দেবের সোনা রূপার প্রকাণ্ড বড় বড় ষাঁড় ময়ূর সিংহাসন ছাতা ও হনুমানজী অনেকগুলিই দেখলাম। এতো বেশী সোনা রুপা হীরা মুক্ত এদিকে সব মন্দিরে আছে যে না দেখলে চিন্তা করা যায় না। এ্যাতো দূরে এসেও ভাগ্যক্রমে ভগবান রামেশ্বরের দর্শন পেলাম না তবে মন্দিরটী সমস্তই ঘুরে ঘুরে দেখেছি। আমরা রাত্রে থাকার জন্য একটা ঘর পেলাম রাস্তায় অনেকগুলি সাথী হয়ে গিয়েছিলো সবাই মিলেই সেই ঘরে রাত কাটালাম ভাড়া ৪৫্ টাকা ভাগ করে দেওয়া হলো। ৫ই ফ্রেব্রুয়ারী সকাল ১০টার ট্রেনে আমরা আবার ফিরলাম মণ্ডপমে। সেখান থেকে লক্ রুমের থেকে মাল নিয়ে আমরা বেলা ২টা ট্রেনে মাদ্রাজ যাত্রা করলাম।

আজ ২৩শে মাঘ ১৩৮১ ইং ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫ বৃহস্পতিবার

২৩শে মাঘ ১৩৮১ সকাল ৮ টায় এসে মাদ্রাজে পৌঁছলাম। উঠলাম স্টেশনের কাছেই সারথী হোটেলে এখানে খুবই জলের কষ্ট ঘরটাও খুব খারাপ

পেলাম। এসেই স্নান সেরে স্টেশনে টিকিটটা পাল্টাতে গেলাম ৯ তারিখের মধ্যে যাতে হয়। আমাদের ১২ তারিখের টিকিট ছিল সবই দেখা হয়ে গেছে আর শুধু শুধু বসে থাকতে ভাল লাগছে না - রোজ ৮৲ টাকা করে ঘর ভাড়া তারপর কিনে কিনে খাওয়া। গেলাম কাপড়ের দোকানে বৌ মেয়ে ও ছেলেদের শাড়ী ও লুঙ্গি কিনলাম আর আমার ব্লাউজ পিস ৩৭৪.৭৪ পয়সা আর কন্যাকুমারীতে কিছু মাদুর, শাঁখ ও পুতুল কিনেছি সেও ১৬/১৭ টাকার মত লেগেছে।

আজ ২৪শে মাঘ ১৩৮১ ইং ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫ শুক্রবার

আজ ২৪শে মাঘ ১৩৮১ ভোর ৫ টায় উঠলাম নাহলে জল পাওয়া যাবে না। মাদ্রাজে রোজ কলে জল দিচ্ছে না। একদিন অন্তর জল দিচ্ছে কর্পোরেশন। স্নান সেরে চা খেয়ে আমরা বেরলাম কাঞ্চিপুরম দেখতে মাদ্রাজ থেকে সোজা বাসে করে কাঞ্চিপুরম যাওয়া যায়। প্রথমে বিষ্ণু কাঞ্চি দর্শন করলাম প্রকাণ্ড মন্দির বিষ্ণু চতুর্ভুজ নারায়ণ লক্ষ্মী দেবী ভূমি দেবী আছেন। আরো কিছু কিছু নারায়ণের নানা মূর্ত্তি আছেন। শিব কাঞ্চিতে শিব লিঙ্গ বেশ বড় তার পিছনে হর পার্ব্বতী আছেন। আর একটি মন্দিরে কালো পাথরের প্রকাণ্ড বামন দেবের মূর্ত্তি এক পা বলি রাজার মাথায় আর এক পা পৃথিবী ও আকাশ পূর্ণ করে দাঁড়িয়ে আছেন। বামন দেবের তৃতীয় পা নেই। পাশের মন্দিরে একম্বর শিব আছেন। এক সিংহাসনে হর পার্ব্বতী বসা মূর্ত্তি, সামনে

লিঙ্গ মূর্ত্তি। বিষ্ণু কাঞ্চিতে সোনার রূপার চন্দ্র-সূর্য্য আর দুটো টিকটিকি আছে সেইটা নাকি দর্শন করলে পাপ নাশ হয়। গেলাম দেখতে ২০ পয়সা টিকিট লাগলো। দর্শন ও পূজা দেওয়ায় অনেক বেশি টাকা লাগে পাণ্ডাগুলো বড়ই অত্যাচার করে বড় বেশী চাহিদা তাদের। অনেক গনেশের মূর্ত্তি আছে চারিদিকে।

তারপর গেলাম কামাক্ষ্মী মাতা দর্শন করতে। মায়ের চতুভুর্জ বসা মূর্ত্তি খুবই ভাল মূর্ত্তি এখানে কোনো টিকিট নেই। মায়ের সোনা হীরার গহনায় ঝলমল করছেন সিংহাসনও সোনার-রূপার এই দেখে আমরা আবার মাদ্রাজে ফিরলাম।

আজ ২৫শে মাঘ ১৩৮১ ইং ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫, শনিবার

আজ ২৪শে মাঘ ১৩৮১ আর কোনোই কাজ নেই। আবার একটি লুঙ্গি কিনলাম তিনটি ব্লাউজ পিস্ কিনলাম, কাল ভোরে আমাদের ট্রেন তার জন্য তৈরী হয়ে নিচ্ছি।

আজ ২৬শে মাঘ ১৩৮১ ইং ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫, রবিবার

আজ ২৬শে মাঘ ১৩৮১, সকাল ৮.৩০মিনিটে ট্রেন ছারলো মাদ্রাজ থেকে (জনতা মেল) রাস্তায় খাওয়ার কোন কিছুই পাওয়া যায়না খুব অসুবিধা খাওয়ার। আমার তো খুবই ঘৃণা করছে খেতে যতটা না খেলে চলে যায় চেষ্টা করছি বাড়ী গিয়ে একেবারে পরিস্কার হয়ে সব কিছু খাব।

আজ ২৭শে মাঘ ১৩৮১ ইং ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫, সোমবার

আজ ২৭শে মাঘ ১৩৮১ দুপুর বেলায় আমরা চিল্‌কার পাশ দিয়ে যাচ্ছি ২৫ মাইল রাস্তা চিল্‌কাকে দেখা যায়, খুব সুন্দর দেখতে এক এক জায়গায় সমুদ্রের সঙ্গে মিশেছে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিলো।

-----x-----